উপন্যাসে উদ্বাস্তুদের ইতিকথা

সায়নী রাহা

জীবের প্রবৃত্তিগত একমাত্র মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হল অস্তিত্ব রক্ষা। মানুষ যেহেতু জীবকুলেরই অংশ, সেহেতু মানুষের ক্ষেত্রেও এর ভিন্নতা দেখা যায়নি। সৃষ্টির সময় মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদা আত্মসম্ভ্রম এই প্রকৃতির বোধগুলো হয়তো ছিল না। তারপর মানুষ অনেকটা পথ হেঁটেছে। এই হাঁটতে গিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া ধনের মতো এরা পেয়েছে আত্মমর্যাদা, অপমান এবং সম্ভ্রমের মতো বোধগুলোকে। যা আমাদের রক্তের মধ্যে ক্রমশ মিশে গেছে। এগুলোর জন্য বেঁচে থাকার অর্থও ক্রমশ পাল্টে গেছে। তাই ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা পরবর্তী সময় পূর্ববঙ্গ থেকে যে সমস্ত মানুষ ভারতবর্ষে এসেছিল তাদেরও এই অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করতে দেখা গেছে। এই লড়াই ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে মানুষের। ধর্মের সীমারেখা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে হঠাৎ একটা সীমান্তরেখা একটা জাতির জীবন তছনছ করে দিয়ে, তাদের দেশ ও বাসভূমিকে আলাদা আলাদা করে দিয়েছে। দেশভাগের পর যে মানুষগুলো নিজের দেশ থেকে উৎখাত হয়ে এসেছিল, শুধুমাত্র একটি নিরাপদ বাসভূমির খোঁজে। নিরাপদ বাসভূমির খোঁজ করতে করতে তাদের স্মৃতি ক্রমশ ঠাঁই পেয়েছে বিস্মৃতির অতলে। দেশের স্মৃতিরচনার প্রসঙ্গে তাদের অন্তরের বেদনা মিশ্রিত কয়েকটি কথা প্রায় সব সময়ই প্রকাশ পেত— আমাদের দেশ আর বাসভূমি আলাদা হয়ে গেছে। আমাদের পায়ের নীচে বাসভূমি হলেও অন্য একজন আমাদের দেশ হয়ে মনের মধ্যে তার এক পৃথক অথচ চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। বাসভূমি তাদের মাথা গোঁজার ঠাই, তাদের দৈনন্দিন ডাল-ভাতের ব্যবস্থা, তাদের রুজি রোজগারের রাস্তা তৈরি করে দিলেও মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সেই দেশ তাঁদেরকে স্মৃতিতে হাতছানি দিয়ে ডেকে গেছে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা ভিটেমাটি ছেড়ে এসেছিলেন, তারা প্রায় সকলেই সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ। তাদের মধ্যে অনেকেরই জমি জমা খেত খামার ছিল। ১৯৪৬ সালে কলকাতা এবং নোয়াখালিতে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাঁধে। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের চলে আসার পেছনেও ছিল সাম্প্রদায়িকতার এই সূক্ষ্ম বর্ডার। কারণ সেই সময় পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের গরিব নিম্নবর্গীয় মুসলমানেরা আক্রমণ করতে থাকে ধনী হিন্দুদেরকে। ফলে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে আসতে থাকে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত সাধারণ অ-মুসলিম মানুষেরা।

তাদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিল মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষজন। যারা পেশায় ছিলেন স্কুল শিক্ষক, কৃষক, তাঁতি, মৎসজীবী এবং ব্যবসায়ী। অন্যদিকে স্বাধীনতার পর পরই পূর্ব বাংলার হিন্দুপ্রধান গ্রামগুলোকে ধীরে ধীরে মুসলমানেরা দখল করে নিতে থাকে। প্রাণের ভয়ে সকলেই রাতের অন্ধকারে নিজেদের স্বদেশ ছেড়ে পাড়ি দেয় নতুন বাসভূমির খোঁজে। এই শ্রেণির মানুষগুলোই এপার বাংলায় তথা ভারতে 'উদ্বাস্তু' বা 'শরণার্থীর' আখ্যা পায়। এই শ্রেণির উদ্বাস্তু সংখ্যা এপার বাংলায় দিনে দিনে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গ এসে প্রথমেই বাসস্থানের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। তাদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল তৎকালীন সরকারের আশ্রয় শিবিরগুলোতে। এই সমস্ত হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের সংঘাত বা রাজনৈতিক টানাপোড়েন সব সময়ই লক্ষ্য করা গেছে। এখানে উল্লেখ্য যে পূর্ব পাকিস্তান থেকেই শুধুমাত্র হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল তাই নয় পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়ও উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে পৌঁছেছিল, তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে পৌঁছে তাদের অবস্থা কি হয়েছিল তার ইতিহাস আমাদের কাছে অনেকটাই অজানা। পশ্চিমবঙ্গেও উদ্বাস্তু বা শরণার্থীদের নিয়ে সেইভাবে ইতিহাস ও সাহিত্যে সরব হতে খুব কমই দেখা গেছে। বাংলার ইতিহাসে উদ্বাস্তুদের নিয়ে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'উদ্বাস্তু' এবং প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর লেখা 'প্রান্তিক মানব পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা' যার ইংরেজি Edition 'দ্যা মার্জিনাল মেন' গ্রন্থ দুটি ছাড়া বাংলা লেখা উদ্বাস্তু ইতিহাস খুবই কম আছে। অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যেও উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে এক ধরনের নীরবতাই লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের কথা যদি ধরি তাহলে দেখব যে, শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থটির শেষ অধ্যায়টিতে দেশভাগের প্রসঙ্গ আসলেও উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গ সেখানে একেবারেই স্থান পায়নি। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থেও প্রায় একই রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিশ শতকের বাংলা উপন্যাস'; 'সাহিত্য এপার বাংলা ওপার বাংলা' গ্রন্থদুটিতে দেশভাগ প্রসঙ্গ এলেও উদ্বাস্তু জীবন সে অর্থে ধরা পড়েনি। তবে 'বাংলা ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থটিতে উদ্বাস্তু জীবনের ছবি সাহিত্যিক পরিসরে আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো দেশভাগ বা পার্টিশন সাহিত্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রচুর কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে উদ্বাস্তু জীবনের ইতিহাস আজো অধরা। তবে কিছু আত্মস্মৃতিকথামূলক কাজ বাংলা ভাগের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে হয়েছে, যেখানে উদ্বাস্তুজীবন কিছুটা উঠে এলেও সম্পূর্ণরূপে আসেনি। এবার আসা যাক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের পরিসরে। উপন্যাস সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের এক ধরনের নীরবতা কাজ করেছে। তাঁরা দেশভাগের সাহিত্যরচনা করেছেন দেশভাগের ইতিহাসকে সামনে রেখে। সেখানে উঠে এসেছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু বাঙালিরা কিভাবে তাদের জন্ম ভিটে ছেড়ে রাতের অন্ধকারে নতুন বাসস্থানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশ্যে পাড়ি

দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়া পাতার নৌকা'; 'শতধারা বয়ে যায়'; অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'; 'মানুষের ঘরবাড়ি'; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন'; জীবনানন্দ দাসের 'জলপাইহাটি'; সাবিত্রী রায়ের 'স্বরলিপি', শঙ্খ ঘোষের 'সুপুরিবনের সারি'; 'সকালবেলার আলো'; সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড'; গায়ত্রী সন্ধ্যা'; 'যুদ্ধ'; আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই'; 'খোয়াবনামা' প্রভৃতি উপন্যাসের কথা। এছাড়া স্মৃতি আলেখ্যমূলক রচনা মিহির সেনগুপ্তের 'বিষাদবৃক্ষ'; সুনন্দা সিকদারের 'দয়াময়ীর কথা' গ্রন্থদুটিকে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু উদ্বাস্তুদের জীবন, বিশেষ করে তাদের ক্যাম্প জীবন, কলোনির জীবন এবং উদ্বাস্তুদের কেন্দ্র করে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, এমনকি এদেরকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান প্রভৃতি ঘটনা দেশভাগ পরবর্তী একটি জাতির ইতিহাস যা উপন্যাস সাহিত্যে সেইভাবে রেখাপাত করতে পারেনি। এর সবচেয়ে বড় কারণ দেশভাগ ও উদ্বাস্তুদের অন্তঃপ্রবাহকে এক করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নিহিত রয়েছে। বিষয় দুটো একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত হলেও, এক নয়। এ প্রসঙ্গে অশ্রুকুমার সিকদারের বিশ্লেষণী মতকে উল্লেখ করা যেতে পারে—

> ইতিহাসে জীবনের নিচের তলার কথা, মগ্ন জীবনের কথা থাকে না— মানুষের অনুভূতি, আঘাত, যন্ত্রণা বেদনা, দুঃস্বপ্ন, অনুরাগ, হাহাকার সবকিছু নীরবতার চাদরে ঢাকা পড়ে যায়। যে-কথা ইতিহাস বলতে পারে না, সেই কথা বলার দায়িত্ব সাহিত্যের। অথচ দেশভাগ দেশত্যাগ নিয়ে ইতিহাস যা বলতে পারেনি, সাহিত্যও তা বলতে অপারগ হল অনেকটাই। (ভাঙা দেশ, ভাঙা মানুষ, বোবা বাংলা সাহিত্য, ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য)

১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে যে উদ্বাস্তু বা শরণার্থী সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা সারা ভারতের কেবলমাত্র পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্র করেই বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। এর মধ্যে পাঞ্জাব বা উদ্বাস্তুরা শরণার্থী সমস্যার একবার সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু বা শরণার্থী আগমনের স্রোত ১৯৪৬-এর নোয়াখালি দাঙ্গা থেকে শুরু করে ১৯৭২ সালে পাকিস্তান বিভাগ পর্যন্ত আছড়ে পড়েছে। প্রথমে দেশটা ধর্মের ভিত্তিতে দুটো ভাগে, পরে সেটা আবার তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে। মূলত দেশভাগের পর থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত হিন্দু বাঙালিরা উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল, ১৯৪৯ সালে তাদের আসার গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে উদ্বাস্তুদের আগমন বন্যার আকার ধারণ করেছিল। মানুষের বন্যা যেন পূর্ববঙ্গের সীমান্ত উপচে পশ্চিমবঙ্গকে প্লাবিত করেছিল। ১৯৫০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আদমসুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ২৩, ০৪, ৫১৪। আবার ১৯৫২ সালের মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১, ৯৩, ৬৬৮ জন। ১৯৫২ সালের ১৫ই অক্টোবর থেকে ভারতবর্ষে পাসপোর্ট বিধি প্রবর্তিত হয়। পাসপোর্ট বিধি প্রবর্তনের পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তুরা উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের

নদিয়া ও চব্বিশ পরগনার সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে পায়ে হেঁটে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছিল। সে সকল উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের মধ্যে ৫৬,০০০ উদ্বাস্তু সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আশ্রয় শিবিরগুলোতে ঠাঁই নিয়েছিল। এর পরেও পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন লেগেই ছিল। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো রক্তাক্ত অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষিত হয়নি। বরং এর পরেও পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তাক্ত ইতিহাস লেখা হয়ে গেছে। যেমন- ১৯৪৯ সালে খুলনা, ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ জেলাগুলোতে দাঙ্গা শুরু হলে উদ্বাস্তু বা শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা শুরু হয়, সেখানে পাকিস্তানি পুলিশ এবং প্যারামিলিটারি বাহিনী কর্তৃক বাঙালি হিন্দুদের ওপর হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নির্যাতন, অপহরণ ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটনার ফলে অসংখ্য মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। ঢাকা, বরিশাল (মুনাদি হত্যাকাণ্ড), চট্টগ্রাম (সীতাকুণ্ড গণহত্যা) সিলেট রাজশাহী (অ্যান্ডারসন সেতুর হত্যাকাণ্ড) ময়মনসিংহ, যশোর ইত্যাদি জেলা এই সময় রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের কবলে পড়েছিল। বিভিন্ন তথ্যে উল্লেখ করতে দেখা গেছে এই সময় বরিশাল থেকে ৬, ৫০,০০০ হিন্দু ভারতে পালিয়ে আসে। আবার ১৯৬২ সালে এপ্রিল মাসে রাজশাহী ও পাবনা জেলার স্থানীয় হিন্দু বৌদ্ধ, সাঁওতালদের গণহত্যার ঘটনা ঘটে। এই গণহত্যার পর ১১,০০০ সাঁওতাল ও রাজবংশী ভারতে পালিয়ে আসে। অন্যদিকে জম্মু-কাশ্মীরে হজরতকাল মসজিদে হজরত মুহম্মদের সংরক্ষিত মাথার চুল চুরি হয়েছে এই গুজবে খুলনা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, সিলেট, ময়মনসিংহ জেলাতেও দাঙ্গা শুরু হয়। ১৯৬৪ সালের পূর্বে পাকিস্তানের দাঙ্গার ফলে কমপক্ষে ১,৩৫,০০০ হিন্দু উদ্বাস্তু ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে এসে দেখা যায় প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তু বা শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। যার মধ্যে ৭৪, ৯৩, ৪৭৪জন পশ্চিমবঙ্গে আশ্রিত উদ্বাস্তু সংখ্যা। আর দ্বিতীয় স্থানে ছিল ত্রিপুরা। এই সময় ত্রিপুরার উদ্বাস্তু সংখ্যা ছিল ১৪, ১৬, ৪৯১। উদ্বাস্তু বা ছিন্নমূল মানুষদের আসার ধারা আজো বহমান। তাই গত শতাব্দীর ন'য়ের দশকে অর্থাৎ ১৯৯০ সালের অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে ভারতে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে যে জাতিদাঙ্গা শুরু হয়, তার ফলে পশ্চিমবঙ্গে আরো একবার হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তুদের স্রোত আছড়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের উদ্বাস্তু বা শরণার্থীদের তথ্য ও পরিসংখ্যান শুধুমাত্র ইতিহাস দিয়েছে। কিন্তু এদের সামাজিক রাজনৈতিক এবং মানসিক অবস্থার বর্ণনা ইতিহাস দিতে পারেনি। যা দিতে পারত বাংলা সাহিত্যের গল্প ও উপন্যাস। আমি এখানে গল্প নিয়ে কিছু বলব না। আলোচ্য বিষয়টিতে আমি কয়েকটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করব। তবে উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে উদ্বাস্তু বা শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গে আসার পর তাদের সামাজিক ও মানসিক পরিস্থিতি এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির টানাপোড়েন এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে অল্প বিস্তর আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে নতুন বাসভূমির খোঁজে আসবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূলতার ঘেরাটোপ তাদেরকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল। এক দুঃস্বপ্নের জগত থেকে বেরিয়ে এসে আরেক অনিশ্চিত জগতের অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছিল তাদের জীবন। তাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বন্ধ্যা, পতিত জমিকে উদ্ধার করতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আসার পর সমস্ত উদ্বাস্তুদের সরকারি শিবির বা ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সেখানে থেকে যাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া যাবে তাদেরকে বেছে বেছে সরকার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিল। আবার অনেকে সরকারি সাহায্য নিয়ে নিজেরাই পুনর্বাসনের চেষ্টায় লেগে পড়ে। এছাড়া প্রথম দিকে যারা এসেছিল তারা নিজেদের পুঁজিকে সম্বল করে থাকার মতো বাসস্থান এবং জীবনধারণের চেষ্টা তারা করে নিয়েছিল। এতো গেল উদ্বাস্তু আগমনের প্রথম দিককার কথা। সময় যত এগিয়েছে উদ্বাস্তু আগমনের ঢল পশ্চিমবঙ্গে তত আছড়ে পড়েছে। তখন থেকেই পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। সরকারের নিজেদের মধ্যে চাপানউতোর দেখা দিতে লাগল। সরকার পরিচালিত ক্যাম্পগুলির অবস্থা ছিল চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর। এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত রাণাঘাটের 'কুপার্সক্যাম্প'; 'ধুবুলিয়া ক্যাম্প' এবং কাশীপুর ক্যাম্প'। যত দিন এগিয়ে যেতে লাগল তত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেবার মতো জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে কমে আসছিল। ফলে উদ্বাস্তুরা নিজেদের পছন্দ মতো জমি জবরদখল করে কলোনি গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এই সমস্ত জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুদের অধিকাংশই ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। কিন্তু যেসব উদ্বাস্তুরা এসে সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কৃষক, জেলে তাঁতি, মিস্ত্রী, গ্রামীণ স্কুল শিক্ষক প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা। এরা একেবারে সর্বহারা হয়ে এদেশে এসেছিল। এরা যখন শিয়ালদহ স্টেশনে এসে আছড়ে পড়তে লাগল। তখন সরকার দিশেহারা হয়ে এদেরকে প্রথমে নিয়ে গেল সাময়িক বিশ্রাম শিবিরে (Transit Camp) এবং সেখান থেকে তাদেরকে সরকারি ত্রাণ শিবিরে এনে জন্তুর মতো ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের দেওয়া হতে লাগল 'ডোল'। যাকে এক কথায় ভিক্ষাই বলা যেতে পারে। চাল, ডাল, আটা এবং শিশুদের জন্য গুঁড়ো দুধ এগুলোই ছিল তাদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে শুকনো ডোল। সভ্য জীবনের সব বাঁধ ভেঙে গেল। নির্বাধ পাশব জীবনের উন্মুক্ততায় ফিরে গেল ক্যাম্পবাসীদের জীবন। নগ্নতা, ক্ষুধা ও মৃত্যু প্রত্যেকটি ত্রাণ শিবিরের ওপর একটি বিষাদের আচ্ছাদন বিছিয়ে দিল। শত শত মানুষ মারা যেত, বিশেষ করে বৃদ্ধ ও শিশুরা। তারা দমবন্ধ হয়ে মরত, পচা আটার শুকনো ডোল খেয়ে মরত, নলকূপের বিষাক্ত পানীয় জল খেয়ে মরত। ক্যাম্পের ভেতরে উৎপাদনশীল কর্মের কোনো সুযোগ ছিল না। অন্যদিকে ক্যাম্পের বাইরে শ্রমের মূল্যে কিছু উপার্জন করা নিষিদ্ধ ছিল। ক্যাম্পের বাইরে কোনো কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়লে তার শাস্তি ছিল সরকার পক্ষ থেকে নগদ ও শুকনো ডোল বন্ধ করে দেওয়া। কুপার্স ও ধুবুলিয়া, ক্যাম্পের মানুষগুলো জীবন ও মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে লড়াই করে গেছে প্রতিনিয়ত। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় রয়েছে সে যন্ত্রণার কথা—

> শত শত শিশু আমাশয়ে মারা গেছে। গোটা ক্যাম্পে সন্তানহারা নারীর আর্তনাদ। রাস্তার দু'পাশে সার বেঁধে মৃত শিশু কোলে নিয়ে মেয়েরা কাঁদছে, অপেক্ষা করছে কখন ট্রাক আসবে, মৃত শিশুদের সৎকার করতে নিয়ে যাবে। (ধুবুলিয়া ক্যাম্প, প্রান্তিক মানব, পৃ ৯৭)

উদ্বাস্তুদের আশ্রয় শিবিরগুলোকে সরকার কতগুলো নামে চিহ্নিত করেছিল। ক) অস্থায়ী ক্যাম্প ও কলোনি; খ) পি. এল ক্যাম্প অথবা সরকারের স্থায়ী দায়িত্বাধীন ক্যাম্প এবং পীড়িতাবাস; গ) ভবঘুরেদের ক্যাম্প, খ) শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মবাসী উদ্বাস্তু। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুরা যখন বন্যার বাঁধভাঙা স্রোতের মতো আসতে লাগল, তখন তাদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তখন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন সরকার অসহায় হয়ে ভারত সরকারের দ্বারস্থ হলে, ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় তার ব্যবস্থা করেন। এই সমস্ত জায়গাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বেতিয়া, চরবেতিয়া, দণ্ডকারণ্য, আন্দামান এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবনের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল। বিহারের চম্পারণ জেলার বেতিয়ায় ছিল পশ্চিমবঙ্গের বাইরে উদ্বাস্তুদের বৃহত্তম ক্যাম্প। চরবেতিয়া, ক্যাম্পও ছিল বিহার প্রদেশে। ওড়িশার কোরাপুট ও মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলার কিছুটা বনাঞ্চল নিয়ে দণ্ডকারণ্য গঠিত। মরুভূমির মতো দেশ দণ্ডকারণ্য। কিন্তু ভারত সরকারের ধারণা হয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সরকারি শিবিরগুলোর মতোই দণ্ডকারণ্যও একটি সরকারি শিবির (ক্যাম্প)। নেহেরু সরকার চেয়েছিল উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে অবিলম্বে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান ঘটাতে। অন্যদিকে বেতিয়ার ক্যাম্পবাসীদের জীবন ক্রমশ হয়ে উঠেছিল কঠিনতর। এই ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের হতাশা গ্রাস করছিল। তারা এখানে সময়মতো ডোল পেত না। তারা বুঝতে পেরেছিল, তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। সেই সঙ্গে তাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ছিল না। বেতিয়ার উদ্বাস্তুদের সত্তর শতাংশ ছিল কৃষিজীবি। এই সমস্ত ক্যাম্পগুলোর উদ্বাস্তুদের মৃত্যু হচ্ছিল অপুষ্টিতে, অনাহারে। রোগে তাদের মৃত্যু হচ্ছিল না। তাদের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। বেতিয়ায় যে জমি ছিল তা উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিতরণ করলে স্থানীয় কৃষকেরা তাদের কাছ থেকে তা কেড়ে নিত। উদ্বাস্তুদের উপর ছিল সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার চাপ। স্থানীয় মানুষদের মধ্যে ধারণা জন্মেছিল যে, উদ্বাস্তু পঙ্গপাল হয়ে চলে আসায় স্থানীয় মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে উঠবে। সুতরাং স্থানীয় দরিদ্র মানুষের মনে উদ্বাস্তুদের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পনেরো হাজার উদ্বাস্তু বেতিয়া ক্যাম্প ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, এই সমস্ত ক্যাম্পগুলোর বেশিরভাগ উদ্বাস্তুই ছিল নমঃশূদ্র শ্রেণির মানুষ। ক্যাম্পবাসী নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নেতা এবং পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী যোগেন মণ্ডল, হেমন্ত বিশ্বাস ও অপূর্বলাল মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিত্বরাও ছিলেন। নমঃশূদ্র শ্রেণির কৃষিজীবী উদ্বাস্তু মানুষগুলোর নেতা হয়ে উঠেছিলেন এই সমস্ত মানুষেরা। এখানে উল্লেখ্য যে, এই যোগেন মণ্ডল-এর জীবন

ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, পশ্চিম পাকিস্তানের মন্ত্রী এবং উদ্বাস্তু হয়ে এপার বাংলায় চলে আসার নানান ঘটনাকে নিয়ে সাহিত্যিক দেবেশ রায় পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে রচনা করলেন 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল'। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের নিয়ে সিটি আই এবং ইউ সি আর সি সংগঠনের নেতারা বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগলেন তৎকালীন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। উদ্বাস্তুদের এ ইতিহাস ছড়িয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি উপন্যাসে। উপন্যাসগুলি হল, নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প'; বল্মীক'; 'অরণ্যদণ্ডক', শক্তিপদ রাজগুরুর 'দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপি', শচীন দাশের 'উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ'; প্রফুল্ল রায়ের 'নোনাজল মিঠে মাটি'; এবং সবশেষে উল্লেখ করতে হয় অমিতাভ ঘোষের Hungry Tried' -এর বাংলা অনুবাদ 'ভাটির দেশ' উপন্যাসটির কথা।।

ছিন্নমূল মানুষগুলো অস্তিত্বরক্ষার জন্য নানা সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত ক্যাম্পগুলোতে প্রথমে স্থান নিয়েছিল। কারণ সেখানে মাসে মাসে সরকারি শুকনো 'ডোল' ও কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া যেতো। সরকার এই ব্যবস্থা চালু রেখেছিলো ততদিন পর্যন্ত, যতদিন এই সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবারগুলোকে পুনর্বাসন দেওয়া না যাচ্ছে। এর পরে সরকার দেখে নিত কোন কোন পরিবারগুলোকে পুনর্বাসন দেওয়া যায়। এমন অনেক পরিবার ছিল যাদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব ছিল না। এই সমস্ত পরিবারগুলো সারাজীবন সরকারের দায়িত্বাধীন। লেখক নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প'; 'বল্মীক' 'অরণ্যদণ্ডক' উপন্যাসগুলোতে উদ্বাস্তু সমস্যা ও উদ্বাস্তুজীবন যাত্রার বিবরণ রয়েছে। 'বকুলতলা পি. এল.ক্যাম্প' উপন্যাসটিতে দেখতে পাওয়া যায়, বাংলা বিহারের সীমারেখার কাছাকাছি গড়ে ওঠা একটি পি. এল. ক্যাম্পের মানুষজনদের জীবনযাত্রার কাহিনি। যুদ্ধের সময় যেখানে সারি সারি মিলিটারিদের ব্যারাক ছিল, দেশভাগের পর ফেলে যাওয়া সেই সমস্ত ছাউনিতে আশ্রয় নেয় হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবার। পশ্চিমবঙ্গে অশোকনগর রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প ও ধুবুলিয়া ক্যাম্পের ক্ষেত্রেও একই নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

> সারি সারি ট্রাক এসে দাঁড়ায় কন্ট্রোল বিল্ডিংটার সামনের মাঠে। অতিথিরা নামে। রণসেনা নয়, মরণসেনা। ওদের পরনে খাঁকি পোশাক নেই— ছিন্ন মলিন বসন। ওদের কাঁধে রাইফেল নেই, কাঁধে কঙ্কালসার শিশু। ওদের মনে যুদ্ধজয়ের দুর্বার প্রেরণা নেই— আছে জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি! ফেলে আসা অতীতের বিভীষিকা— আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আতঙ্ক। ওরা এসে গেল দলে দলে। হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবার। নবীনতম রাষ্ট্রের প্রবীণতম আদিম বিদেশী অধিবাসী! সেনা নিবাস পরিণত হল আশ্রয় শিবিরে। (পৃ ১২)

আদিপর্বে এই ক্যাম্পগুলোর নামকরণ হয়েছিল ট্র্যানজিট ক্যাম্প। অর্থাৎ দুদিনের মুশাফিরখানায় ওরা এসে আশ্রয় নিত মাত্র। তারপর ওদের বাছাই করা হত। যারা শক্ত সবল, তারা চলে যেত পুনর্বাসনে। কেউ কেউ চলে যেত নিজের চেষ্টাতেই। তাদের কারও

বা ছিল পুঁজির জোর, কারও বা এপারে আত্মীয়পরিজন। এদের মধ্যে অনেকেই সরকারি সাহায্য পেল নতুন বাড়ি করার। বাকি যারা ক্যাম্পগুলোতে থেকে গেল তারা বেশিরভাগই পঙ্গু অথবা অশক্ত। এরাই সরকারের স্থায়ী পোষ্য। পার্মানেন্ট লায়েবিলিটি (পি. এল) -এর অন্তর্ভুক্ত। উদ্বাস্তুরা নিজেদের ফেলে আসা জাত-পরিচয় ভুলে শুধুমাত্র 'উদ্বাস্তু' পরিচয়ে সকলে এক সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে ক্যাম্পগুলোতে বসবাস করতে লাগল। একসঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষার যে লড়াই চালিয়েছিল উদ্বাস্তুরা তারই বিবরণ লেখক উপন্যাসটিতে দিয়েছেন—

''ঘরগুলোও আবার সব একরকমের নয়। কিছু একেবারে পাকা, অধিকাংশই বাঁশের চটার উপর সিমেন্ট ধরানো। জাবওয়াল বলে এদের। এছাড়া মুলিবাঁশ এবং দরমার দেওয়াল আছে। ছাদ অধিকাংশই খড়ের। টিন, টালি এবং পাকা ছাদও আছে। বাড়িগুলি ব্যারাক-টাইপ। লম্বা লম্বা হলঘর। কোনটার একদিকে, কোনটার বা দুদিকেই বারান্দা। হল—ঘরগুলির অনেকগুলির মাঝে দর্মার পার্টিশন ছিল বোঝা যায়। দরমার ফসিল ঝুলছে কোথাও কোথাও। শতকরা আশিখানা বাড়িরই পার্টিশন নেই। তবু শালের খুঁটির চিহ্ন ধরে ওরা নিজ নিজ এলাকা ঠিক করে নিয়েছে। এক হলঘরের মধ্যেই বাস করছে নির্বিচারে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, বৈদ্য এমনকি জল-অচল জাত পর্যন্ত।''

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ট্রানজিট ও পি. এল ক্যাম্পগুলোকে কেন্দ্র করে দুর্নীতি ও কালোবাজারি শুরু করে পাঞ্জাবী ছুতার, সিন্ধি ঠিকাদার, উড়িয়া প্লাম্বার আর মদ্রদেশীয় কুলিরা। এদের সঙ্গে যুক্ত হয় 'নক্র'র মতো ডাক্তারেরা। উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলোতে চিকিৎসা ব্যবস্থা তথৈবচ, ছিল না বললেই চলে। চিকিৎসার অভাবে মানুষের মৃত্যু রোজনামচায় পরিণত হয়েছিল। অনাহারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যক্ষার মতো রোগ। পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে অসংখ্য উদ্বাস্তু মানুষ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছে। সেই সঙ্গে সরকারি ত্রাণ শিবিরের খিচুড়ি বা সরকারের শুকনো ডোলের পচা আটা, নষ্ট দুধ খাওয়ার ফলে অসংখ্য শিশুর আমাশা বা ডায়েরিয়ার মতো অসুখে মৃত্যু হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে সরকারি ডোল' উদ্বাস্তু তরুণদের কর্মবিমুখ করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে এই সমস্ত তরুণেরাই রাজনৈতিক দলাদলির শিকার। স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির সদস্যসংখ্যা এই সমস্ত তরুণদের দ্বারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধির একটি বড় কারণ হল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু মানুষেরা। এই সময় থেকেই শিশু নারী, তরুণীদের সঙ্গে অন্ধকার জগতের সম্পর্ক বেশি করে গড়ে ওঠে।

নারায়ণ সান্যালের 'বল্মীক' উপন্যাসটিতে দেখতে পাওয়া যায়, ক্যাম্প থেকে যে সমস্ত মানুষদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল তারা সরকার নির্দিষ্ট পুনর্বাসন জমিতে কিভাবে কলোনি গড়ে তুলেছিল, কলোনি গড়ে ওঠাকে কেন্দ্র করে উদ্বাস্তুদের নিজেদের মধ্যেই মতবিরোধ ও দলাদলি লক্ষ্য করা যায়। উদ্বাস্তু পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক বিপন্নতা পরিবারের কৈশোর অবস্থাকে কেড়ে নিয়েছিল। সংসার চালানোর জন্য কিশোরজীবনকে নামিয়ে

এনেছিল ট্রেনের হকারিতে। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সংখ্যা যত বেড়েছে, হকার সংখ্যাও তত বেড়েছে। সেই সঙ্গে ট্রেনের চাকার তলায় লেখা হয়েছে এদের অমোঘ নিয়তি। ট্রেনের চাকায় অনেকের জীবন অকালেই ঝরে গেছে। উপন্যাসটিতে হরিপদ চক্রবর্তীর পরিবারের সঙ্গেও এমনই কিছু ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। উপন্যাসটির কাহিনি গড়ে উঠেছে উদয়নগর উদ্বাস্তু কলোনির সমাজ জীবন ও রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে। 'বিস্তীর্ণ' ধানক্ষেতের মধ্যে জেগে উঠেছে নতুন বসতি। এলোমেলো অগোছালো গ্রাম নয়। দস্তুর মত প্ল্যান করা গ্রামনগরী।... প্রত্যেকটা বাড়ি করার খরচ বাবদ সরকারি খাতায় ঋণের পরিমাণ সাড়ে বাইশশ টাকা। এক চুল এদিক ওদিক নেই।' হরিপদ মাস্টারের ঘরের বর্ণনাতেই কলোনির সদ্য গড়ে ওঠা ঘরগুলোর অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

"ঘর একখানাই। তার মাঝামাঝি একটা শাড়ি টাঙ্গিয়ে একপাশে রাত্রিযাপন করেন হরিপদ মাস্টার আর স্ত্রী বিন্দুবাসিনী। নমিতা আর লতু সে দিকেরই ভাগীদার। শাড়ির অপরপাশে, গৌরবের পাশের ঘরে, অনিমেষ আর কামিনী নিম্নস্বরে দাম্পত্য আলাপ করে। গোরা শোয় ওদের কাছেই। অন্ধের কনিষ্ঠ সন্তান এগারো বছরের বাবলু যে কোথায় শোয় তা বোধহয় সে নিজেই জানে না।"

উপন্যাসটিতে লেখক হরিপদ মাষ্টারের পরিবারের পারিবারিক চিত্র আঁকার পাশাপাশি উদয়নগর কলোনি কিভাবে গড়ে উঠেছে তারও একটা বর্ণনা দিয়েছেন। এ শুধু বিজয়নগর কলোনিই নয়, সেই সময় সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে সমস্ত কলোনি গড়ে উঠেছিল তার প্রায় প্রত্যেকটির চিত্রই ছিল একইরকম। পার্মানেন্ট লায়াবেলিটি ক্যাম্পের নরকবাস যখন অনেক উদ্বাস্তুদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তখন সেই মানুষগুলো স্বপ্ন দেখতো পুনর্বাসনের। তাছাড়া সরকারি ডোলের ব্যবস্থা অনেকে মেনে নিতে পারেনি। তাদেরও ইচ্ছে করল মানুষের মতো বাঁচতে। যখন তারা জানতে পারল সরকার তাদের জমি দেবে এবং বাড়ি করবার জন্য ঋণ দেবে। তখন তাদের মনে হল, পায়ের নিচে এক মুঠো নিজস্ব জমি,— যেখানে লাউ-কুমড়ো- শাক-আলু-বিলাতি বেগুনের চাষ করতে পারবে এবং ঐ জমিতে নিজেদের একখানা করে ঘর তৈরি করতে পারবে। এই সমস্ত ভেবে তারা এক প্রকার স্বস্তি লাভ করেছিল। ফলে ধীরে ধীরে মাঠগুলিতে জনপদ গড়ে উঠেছে। কিন্তু সমস্যা তাদের ছেড়ে যাবার নয়। কারণ তাদের কারোরই রোজগার ছিল না। সরকারি ডোল বন্ধ হয়ে যাবার পর খাবারের চিন্তা তাদের বেশি করে হতে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাজারে দোকান দিল। আবার কেউ মহাজনের কাছ থেকে সাইকেল রিক্সা নিয়ে এসেছিল ভাড়া খাটাবে বলে। আবার বাবলুর মতো কিশোর নেমে পড়েছিল ট্রেনের হকারিতে।

"অচল সংসারটিকে কোন রকমে চালিয়ে নেওয়ার জন্যই এই প্রচেষ্টা কামিনীর। সংসারের প্রত্যেকটি লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে গভীর রাত্রে সে চিড়ে ভাজে। চীনাবাদাম মটর ভাজা মিশিয়ে পাতলা টিসু পেপার মুড়ে রেখে দেয়। সকালবেলা বাবলু সেগুলি নিয়ে বেরিয়ে যায়। লোকাল ট্রেনের কামরায় কামরায় ফেরি করে উদয়নগরের স্পেশাল ব্র্যান্ড

সারে-চার ভাজা। টক্-ঝাল-মিষ্টি-মিষ্টি। এক প্যাকেট এক আনা, তিনটে দু-আনা।

এ ব্যবসাতেও দুরন্ত প্রতিযোগিতা চলে। আরও চার পাঁচ জন হকার ফেরি করে। রোজই তারা বিক্রি করে একই ট্রেনগুলিতে। ওরাও বরদাস্ত করতে পায় না নতুন কোনো হকারকে।

'অরণ্যদণ্ডক' উপন্যাসটিতে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিহার-মধ্যপ্রদেশের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জুড়ে তৎকালীন ভারতসরকার পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তারই খণ্ডচিত্র দেখতে পাই। এ যেন অরণ্যের বিরুদ্ধে মানব সন্তানের শঙ্খ নির্ঘোষ। অন্ধ্র, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এই তিনটি প্রদেশ জুড়ে চলেছে সরকারের বিরাট পরিকল্পনা। আদিম-ভারতবর্ষ পাষাণী অহল্যার মতো এখানে ঘুমিয়ে ছিল। আর সেখানেই পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন ভারত সরকার। পশ্চিমবঙ্গে যখন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার মতো জমি ছিল না, তখন ভারত সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে, তারা এই তিন প্রদেশের বিস্তৃর্ণ অরণ্য অঞ্চল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ করেন। তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'বাঙলাদেশে আর চাষের জমি নেই'— তোমরা দণ্ডকারণ্যে চল, সেখানে তোমাদের জন্য পাকাবাড়ি, হাসিল জমি, ভালো জাতের বলদ, গরু, লাঙল, বীজ দেওয়া হবে। সেই আশায় ছুটে এসেছে মানুষগুলো, এই উপলবন্ধুর রাঙামাটির দেশে' এই সমস্ত উদ্বাস্তুরা রিসেপ্শন সেন্টার থেকে ট্রানসিট সেন্টার, পি. এল ক্যাম্প, পুনর্বাসন কলোনি, সরকারি- আধাসরকারি-বেসরকারি জবরদখল কলোনি, গয়েশ পু র-তাহেরপুর-হাবড়া, প্রফুল্লনগর, নেতাজিনগর, রবীন্দ্রনগর, জওহর-কলোনি, এছাড়া বিহার -উড়িষ্যা-আসাম ঘুরে এসে শেষ পর্যন্ত স্থান হয়েছিল দণ্ডকারণ্যে। এই ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। কিন্তু উপন্যাসটিতে সেই ইতিহাসের উল্লেখ থাকলেও তার বিবরণ এখানে খুবই অল্প। উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে চলে আসার পর তাদের জীবনের নানা সংগ্রামের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। একটি কথা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়, সেটি উপন্যাসটির গঠন কৌশল। আলোচ্য বিষয়বস্তুর নিরিখে উপন্যাসটিতে উদ্বাস্তুদের জীবনের রামায়ণ রচনা করতে লেখক সচেষ্ট হয়েছিলেন। উপন্যাসের অধ্যায়গুলিকে রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডের মতো নামকরণ করে উদ্বাস্তুদের পূর্ব জীবন অর্থাৎ স্বাধীনতার পূর্ব থেকে দণ্ডকারণ্যে আসার পরবর্তী জীবন পর্যন্ত এখানে বর্ণিত হয়েছে। আসলে উপন্যাসটিকে লেখক নারায়ণ সান্যালের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল বলা যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপন্যাসটিতে কিছু বাস্তবতার ছবি বাদ পড়ে গেছে। 'প্রান্তিক মানব' গ্রন্থটিতে প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী দণ্ডকারণ্যে আসা উদ্বাস্তুদের জীবনের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন— বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে নিয়ে আসা উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন উপনিবেশে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু যখন ওদের নিয়ে আসা হয় তখনও দণ্ডকারণ্যে কোনো উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে ওঠেনি। জঙ্গল কাটা হয়নি। উপনিবেশে যাওয়ার রাস্তা তৈরি হয়নি। উর্বর জমিকে চাষযোগ্য করা হয়নি। তাই যাদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল, তারা এখানেই পড়ে রইল। অথচ ক্রমাগতই দলে দলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের নিয়ে

আসা হতে লাগল।... উদ্বাস্তুরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। বিদ্রোহের অনায়াস প্রতিকার ছিল প্রশাসনের হাতে। নির্মম ঠ্যাঙানি, গুলি, মৃত্যু। তারপর উদ্বাস্তুদের কয়েকটি দলকে ক্যাম্পে থেকে ট্রাকে তুলে অরণ্যের কোনো অন্ধকারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।... পাথর কেটে রাস্তা তৈরি করার জন্য, বন কেটে বসত বানানোর জন্য।

১৯৫১ সালের ১৭ই মার্চ তিরিশটি উদ্বাস্তু পরিবার আন্দামানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। এই বিষয়ে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব উক্তি—

"ক্ষুদ্র বাংলাদেশে পূর্ব পাকিস্তান হতে আগত সকল উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসন সম্ভব নয়, এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথম হতেই অবহিত ছিলেন। অন্তত পশ্চিমবাংলার বাইরে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সম্ভব হলে তার সুযোগ যে সম্পূর্ণ নেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকতে পারে না। তাতে পুনর্বাসন ত্বরান্বিত হয় না, সরকারের পুনর্বাসন দেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।"

হিন্দু বাঙালিরা আন্দামান দ্বীপে গিয়ে নতুন করে উপনিবেশ গড়ে তুলল। তাদের সেই উপনিবেশ গড়ার যাত্রাপথ খুব সহজ হয়নি। আন্দামান দ্বীপে পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী নদীর প্রাণবন্ত এক সজীব প্রকৃতির বাসিন্দারা এসেছে উপনিবেশ গড়ে তুলতে। তারা নিজের ইচ্ছাতে এখানে আসেনি, ভাগ্য তাদের এখানে নিয়ে এসেছে। প্রকৃতির কঠিন ও আগ্রাসী রূপের সঙ্গে মানুষের অসম দ্বন্দ্ব। প্রকৃতি তার অস্তিত্ব রক্ষা করবে, না মানুষ অস্তিত্ব রক্ষা করবে, এই অসম দ্বন্দ্ব চলতে থাকে ক্রমাগত। শেষ পর্যন্ত মানুষ কঠিন, রুক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে করতে তার অস্তিত্ব রক্ষায় সফল হয়। মানুষের এই অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের এক অসাধারণ উপন্যাস প্রফুল্ল রায়ের 'নোনাজল মিঠে মাটি'। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষগুলো ভাবতেই পারে না, কেমন করে দেশটা ভাগ হয়ে গেল। তাদেরকে 'সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে, জমি-জিরাত, এই গ্রাম, আর মিঠান নদী ধলেশ্বরীর মায়া কাটিয়ে অন্য কোথায় চলে যেতে হবে।' এই সমস্ত মানুষগুলো যখন কলকাতায় এসে পৌঁছয় তখন থেকেই এদের জীবন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম; প্ল্যাটফর্ম থেকে ফুটপাথে, ফুটপাথ থেকে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরতে লাগল মানুষগুলো। এই সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষগুলো পেটটাকে ভরাবার তাড়নায় উন্মাদ হয়ে উঠল। হাজারে হাজারে লাখে লাখে মানুষ খাদ্যের জন্য এবং ক্ষুধার নামে আদিম জৈবিক দাবিটাকে ঠাণ্ডা করার জন্য না পারল হেন কাজ নেই। পশুদের মতো বর্বর জীবন উদ্বাস্তুরা কলকাতায় আসার পর থেকেই ভোগ করতে লাগল। এক এক সময় তাদের ধন্দ লেগেছে, একে আদৌ জীবন বলে কিনা। এই অবস্থার বিবরণ লেখক দিয়েছেন—

> দেশভাগ তাদের ঘরছাড়া করেছে। উদ্বাস্তু ক্যাম্পের ন'দশ বছরের জীবনে তারা সব খুইয়েছে। মানুষের মতো বেঁচে থাকতে হলে মোটামুটি জীবনের যে ধর্মগুলো মেনে চলতে হয়, ক্যাম্পে এসে সেগুলোও তারা হারিয়ে ফেলেছে।

ক্যাম্প তাদের ক্যাশ ডোল, খয়রাত এবং ভিক্ষের উপর নির্ভর করতে শিখিয়েছে।

এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের জন্য সরকার থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যে, আন্দামান দ্বীপে এদের পুনর্বাসন সেখানে তারা নতুন করে জমি, মাটি ও জীবন পাবে। আশায় আশায় সকলে বুক বাঁধল। জমি পাবে, মাটি পাবে, জীবন পাবে, নতুন করে বেঁচে উঠবে। বাঁচার আশায় অন্ধ হয়ে কত মানুষ কালাপানির জাহাজে উঠে পড়ে। নতুন ঘরের আশায় সমুদ্র পেরিয়ে যারা এখানে এসেছে তাদের কেউ বারুজীবী, কেউ সোনারা, কেউ কামার, কেউ কুমার, কেউ জোলা, কেউ মালো, কেউ যুগী, কেউ কাহার আবার কেউ সদ্‌গোপ। এই সমস্ত নিঃস্ব যাযাবর মানুষগুলি আন্দামান দ্বীপে এসে মাটি পেয়েছে। পায়ের নীচে আশ্রয় পেয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। 'এতকাল অরণ্য এই দ্বীপের মাটি ভোগ করেছে। এখন মানুষ এসেছে, তার প্রয়োজন এসেছে। কোদালের মুখে মুখে অরণ্য মাটির দাবি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। নতুন করে বাঁচার জন্য এই উদ্বাস্তু মানুষগুলোর যে মাটি চাই।' বাঁচার নেশায় এই সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষগুলো বুঁদ হয়েছিল। আন্দামান দ্বীপে পৌঁছে এই সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষগুলো অনুচ্চ ফিস ফিস স্বরে বলে, 'বাঁচুম, আমরা বাঁচুম।' এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের বাঁচার লড়াইটা ছিল দীর্ঘ। এই দীর্ঘ ইতিহাস লেখক প্রফুল্ল রায় লিখেছেন। কিন্তু এদের জীবনের পরবর্তী কাহিনি উপন্যাসটিতে নেই বললেই চলে। এদের নিয়ে রাজনৈতিক মহলের যে টানাপোড়েন, যা স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল, তা উপন্যাসগুলিতে নেই বললেই চলে। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে উপন্যাসগুলিকে ঠিক রাজনৈতিক উপন্যাস বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। এই উপন্যাসগুলিকে উদ্বাস্তুদের জীবনের খানিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া উদ্বাস্তুদের জীবন নিয়ে শক্তিপদ রাজগুরু লিখেছিলেন 'দণ্ডক থেকে মরিচ ঝাঁপি' নামে উপন্যাস। সেখানেও দেখানো হয়েছে উদ্বাস্তুদের জীবনে ঘনিয়ে ওঠা বিপর্যয়কে। তবে এখানে অমিতাভ ঘোষের Hungry tried (যার বাংলা অনুবাদ ভাঁটির দেশে) কথা উল্লেখ না করে পারছি না। ১৯৭৯ সালে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু বিতাড়নকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্য-রাজনীতি যেভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তার পূর্ব ও পরবর্তী পর্বের ঘটনার বিবরণ রয়েছে উপন্যাসটিতে। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস লেখকেরা ১৯৭৯ সালের মরিচঝাঁপির ঘটনাকে উপন্যাস সাহিত্য থেকে দূরেই রেখেছেন। অর্থাৎ দেশভাগের সাহিত্যে উদ্বাস্তু সমস্যা এলেও তা ক্ষুদ্র পরিসরে এসেছে।

একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, দেশভাগ পূর্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস যেভাবে বাংলা উপন্যাসগুলিতে স্থান পেয়েছে, দেশভাগ পরবর্তী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছিল তা আজও বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অধরাই রয়েছে। সেই রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা। স্বাধীনতার বহুবছর পরেও পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন হয়েই চলেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু সমস্যা একটা বড় হাতিয়ার বিশেষ। কারণ উদ্বাস্তু সমস্যাকে হাতিয়ার করে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. আই . এম -এর নেতৃত্বে

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। সাহিত্যক্ষেত্রে এই বিষয়টির গুরুত্ব সেইরূপে না থাকলেও উদ্বাস্তুদের জীবন কিভাবে রাজনৈতিক দলের দাবার চালে পরিণত হয়েছে তার কিছুটা পরিচয় থাকা জরুরি। কারণ সাহিত্যই পারে সমাজের বিভিন্ন দিকগুলিকে সঠিকভাবে তুলে ধরে সংশোধন করতে। তাই একটি কথা বলে বিষয়টি শেষ করব ঔপনিবেশিক শাসন পরবর্তী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাবাহিক ঘটনার বর্ণনা বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন আঙ্গিকে উঠে আসা একান্তই প্রয়োজন।

তথ্যঋণ :

১। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়— উদ্বাস্তু; দীপ প্রকাশন; ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

২। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী— প্রান্তিক মানব, দীপ প্রকাশন; সেপ্টেম্বর ২০১৯।

৩। ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য — অশ্রুকুমার সিকদার; দে'জ পাবলিশিং; নভেম্বর ২০০৫।

৪। নারায়ণ সান্যাল— বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স।

৫। নারায়ণ সান্যাল— বল্মীক, বেঙ্গল পাবলিশার্স।

৬। নারায়ণ সান্যাল— অরণ্যদণ্ডক, বেঙ্গল পাবলিশার্স।

৭। প্রফুল্ল রায়— নোনা জল মিঠে মাটি— গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

৮। অমিতাভ ঘোষ— ভাটির দেশ, আনন্দ পাবলিশার্স।

৯। শক্তিপদ রাজগুরু— দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপি— যূথিকা বুক স্টল।